জন্মশতবর্ষে অধ্যাপক আবদুল মুক্তাদির

২০০৯ সালের ১লা ডিসেম্বর (পয়লা ডিসেম্বর) আবদুল মুক্তাদির এর জন্মের শতবর্ষ। আজ এমন একটি সময়ে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিকীকরণ বিষয় নিয়ে সরকার এবং সমস্ত প্রগতিশীল মানুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। শিক্ষাই জাতির বিশ্বাসের মূল ভিত্। অধ্যাপক আবদুল মুকতাদির শিক্ষার জন্যে, বিশেষ করে শিক্ষকদের শিক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কেবল বিশেষ কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকরাই অগ্রণী হয়ে শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম।

অধ্যাপক মুকতাদির সন্দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গোপসাগরের কোলে মেঘনা নদীর মোহনায় সেই গ্রামে তিনি উপভোগ করতেন প্রকৃতির অবাধ উদারতা আর সাগরের উদ্দামতা। তাঁর বাবা মৌলভী মকবুল আহমেদ ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার গ্র্যাজুয়েট। তিনি খুলনার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার একটি মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী পড়াতেন। তাঁর চাচা ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্বনামধন্য এবং বিশেষভাবে সুপরিচিত। তিনি উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নাম। অধ্যাপক মুক্তাদির এর আরেক চাচা আলহাজ্জ্ব খোরশেদ আলম সন্দ্বীপের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি কিছুদিন খাজনা আদায়কারী হিসেবেও কাজ করেছেন।

অধ্যাপক মুক্তাদির এর চাচা মোজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধুত্বের সূত্রে অধ্যাপক মুক্তাদির বিদ্রোহী কবির সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে কলেজ জীবনে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সন্দ্বীপ ভ্রমনের সময়ে তিনি ছিলেন কবির নিত্য সঙ্গী।

অধ্যাপক মুক্তাদিররা তিন বোন ও তিন ভাই। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভাই ডঃ তরিকুল আলম পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক আবদুল মুক্তাদির ১৯২৭ সালে সন্দ্বীপ কারগিল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ডিস্ট্রিংশনসহ ম্যাট্রিক পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯২৯ এ আইএসসি পাশ করেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তিনি মহসীন বৃত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর বাবার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভালো না থাকায় এই বৃত্তি তাঁকে উচ্চ শিক্ষায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এবং ১৯৩৩ সালে জৈব রসায়নে এমএসসি তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তিনি আবার তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্র হিসেবে এই গৌরব অর্জন করায় তাঁকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে অধ্যাপক মুক্তাদির সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপক মুক্তাদির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এখানে এটা উল্লেখ করা যায় যে, তিনি রসায়নের বিখ্যাত অধ্যাপক কে.ডি. ঘোষ এবং পদার্থবিদ্যার বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর যোগ্য এবং কৃতি ছাত্র ছিলেন। একথা সর্বজনবিদিত যে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের সঙ্গে মিলিত ভাবে বোস-আইনষ্টাইন তত্ত্বের জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করে অধ্যাপক মুক্তাদির তেজগাঁয়ে মনিপুর কৃষিখামারে কনিষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক গবেষনাগারে আয়ূর্বেদিক ঔষধি গাছের উপর গবেষনা কাজ চালিয়েছিলেন এবং সেই গবেষনার উপর নির্ভর করে একটি পেপার তৈরী করে সুনাম অর্জন করেন।

১৯৩৫ সালে অধ্যাপক মুক্তাদির মানিকগঞ্জের হাদিনগরের মওলানা মবিনুদ্দিন আহমেদের তৃতীয় কন্যা রফিকা বেগমের সঙ্গে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হন। রফিকা বেগম তখন কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। বাবা ছিলেন শুল্ক কমিশনার। তিনি পবিত্র কোরআনের অর্থ ও বিশ্লেষণ সহ পাঁচ খন্ডের বই রচনার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এখনও তাঁর বইগুলি প্রকাশিত হয়ে চলেছে এবং ধর্মীয় পন্ডিতগনের কাছে সেগুলোর গুরুত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক মুক্তাদির ১৯৩৫ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে স্নাতকোত্তর পড়ালেখার জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের শিক্ষাবৃত্তি লাভ করায় কৃষিখামারের চাকরি ছেড়ে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রচন্ড অসুস্থতার জন্য তিনি তখন আর বিলেত যেতে পারেননি। ১৯৩৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডে উচ্চতর শিক্ষার জন্য আরেকটি সম্মানজনক বৃত্তি লাভ করেন। ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেই সময় স্ত্রী এবং দুবছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে ইংল্যান্ডে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

অধ্যাপক মুক্তাদিরের জীবনে একটি বিশেষ আক্ষেপ ছিলো বিদেশে পড়তে যাবার ইচ্ছে অপূর্ণ থাকা। সে দুঃখ সঙ্গী করেই পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিখ্যাত শিক্ষানুরাগী খান বাহাদুর আব্দুর রহমানের আহ্বানে সেই কলেজে যোগদান করেন। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী কে.ডি. ঘোষও তাঁকে সেখানে যোগ দেবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি প্রথম বিভাগের প্রশিক্ষণের উপরে স্নাতক ডিপ্লোমা অর্জন করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে ৬ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে আরমানিটোলা সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি হন। এই প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের গবেষনা স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ১৯৪৬ সালে অধ্যাপক মুক্তাদির কলকাতার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পরে পাকিস্তান একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে অধ্যাপক মুক্তাদির পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। ১৯৪৮ সালে সিলেটের এমসি কলেজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন আগে তিনি রাজশাহী সরকারী কলেজে যোগ দেন। এই কলেজে তিনি গাছগাছালি নিয়ে গবেষণা করার সময় ও সুযোগ পান, এই সুযোগের তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ময়মনসিংহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে বদলি হন এবং এই বদলির ঘটনা তাঁকে সুযোগ এনে দেয় অধ্যাপক শামসুল হকের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান শিক্ষার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের। এই সময়ে তাঁর বিদেশে জ্ঞান আরোহণের সুযোগ এসে যায়। তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পয়েন্ট ফোর কর্মসূচীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরবানা স্যাম্পেনের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি লাভ করেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫১-৫২ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। অধ্যাপক মুক্তাদির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য শিশু বান্ধব শিক্ষাদানের পরীক্ষামূলক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। অধ্যাপক মুক্তাদির ১৯৫৫ সালে ময়মনসিংহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন এবং তিনি স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের সাহায্যে নতুনভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেন। সেই সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান শিক্ষাদান ও শিক্ষা প্রশাসনে সুদূরপ্রসারী প্রেরণা যোগায়। ১৯৫৬ সালে অধ্যাপক মুকতাদির ব্যাংককে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের প্রাথমিক শিক্ষা ফোরামে অংশগ্রহণকারী দলের নেতৃত্ব দেন।

অধ্যাপক মুক্তাদির পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালযের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠে। কেন্দ্রটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিলো মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান। তাঁর নেতৃত্বে কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচীতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। তিনি যখন এই কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন সেই সময় পুরষ্কার প্রাপ্ত গ্রীক স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান ডকসিআইডিস অ্যাসোসিয়েটসের নকশায় অ্যাকাডেমিক ভবন এবং বিভিন্ন আবাসিক ভবনের একটি খুব সুন্দর কমপ্লেক্স সেখানে গড়ে ওঠে।

১৯৬০ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন সারাদেশে একটি উন্নতমানের একমুখী শিক্ষা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মিলিত হয়। কমিশন ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। অধ্যাপক মুক্তাদির এই কমিশনে কাজ করার জন্যে মনোনীত হন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। পরবর্তী কয়েক বছরে পাকিস্তানের জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে তাঁর প্রচেষ্টা বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ অধ্যাপক মুক্তাদিরকে ১৯৬৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত লাহোরে পাকিস্তানের প্রশাসনিক ষ্টাফ কলেজে অনুষ্ঠিত সিনিয়র লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে আমন্ত্রন জানানো হয়। ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে নির্বাচিত অনেক বইও তিনি সম্পাদনা করেন।

অধ্যাপক মুক্তাদিরের যোগ্য নেতৃত্বে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র হাজার হাজার স্কুল ও কলেজ এর শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের আধুনিক শিক্ষাদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সাত বছরেরও বেশি সময় তিনি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের ২০টি স্কুলকে নতুন ধারার শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রচলনের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছিলো। এই পদ্ধতি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয় শিক্ষাদান পদ্ধতিকে অনুসরণ করতো। অধ্যাপক মুক্তাদির ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। উন্নয়নশীল দেশের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষক প্রশিক্ষণে নিত্যনতুন ধারা উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করায় শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রটি দেশে বিদেশে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেবার আগে অধ্যাপক মুক্তাদির যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্বপালন করেন। তিনি দায়িত্বে থাকার সময়ে বোর্ডের জন্যে নতুন একটি স্থান নির্বাচন এবং প্রশাসনিক ভবন নির্মানের কাজ শুরু হয়।

অধ্যাপক মুক্তাদির ১৯৬৮ সালে অবসর নেবার পরে তাঁর পারিবারিক কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর সন্তানদের এবং প্রপৌত্রদের নিয়ে এই সময়ে তিনি ব্যস্ত ও তৃপ্ত সময় কাটান। আরেকটি বিষয় এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার যে, তিনি কবিতা লিখতেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতে খুব ভালোবাসতেন।

অধ্যাপক মুক্তাদির এর জীবনচর্যায় তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা ও অবদানের কথা বিশেষ ভাবে স্মরনযোগ্য। তাঁর স্ত্রীর ছিলো নিমগ্ন একাগ্রতা সংসারের প্রতি। স্বামী যাতে শিক্ষাক্ষেত্রের নানা কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করতে পারেন এবং অবদান রাখতে পারেন তার জন্যে একটি বৃহৎ সংসার পরিচালনায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন।

অধ্যাপক আবদুল মুক্তাদির ১৯৯৩ সালের ৫ মার্চ প্রয়াত হন। তার মাত্র ৬ মাস আগে অধ্যাপক মুক্তাদিরের সুযোগ্যা স্ত্রীর প্রয়াণ ঘটে। তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই দেশে এবং বিদেশে পড়াশুনা করে সফল চাকুরীজীবি হয়েছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। তাঁর বড়ো ছেলে আবদুল কাইয়ুম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সার্ভিসের সদস্য ছিলেন এবং মরক্কোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে ১৯৯৫ সালে অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড এই ভাবনা এবং বিশ্বাসের অগ্রদূত ছিলেন অধ্যাপক আবদুল মুক্তাদির। তিনি সারাজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিলো একটি সুশিক্ষিত জাতিগঠন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক রূপ দেবার জন্যে তিনি রীতিমতো সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের বাস্তবতা উপলব্ধি করে তিনি তাঁর সময়ে এবং কার্যকালে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারে এক বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, দিয়েছিলেন দিক নির্দেশনা। তিনি দিয়েছিলেন এক প্রত্যয়ী সফল স্মরণযোগ্য নেতৃত্ব। বাংলাদেশের শিক্ষাজগৎ এখনো তাঁর অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করে। দেশ এই নিঃস্বার্থ, আলোর দিশারী, আত্মত্যাগী শিক্ষাবিদ ও পথপ্রদর্শকের কাছে গভীরভাবে ঋনী।

অধ্যাপক আবদুল মুক্তাদিরের জন্মশতবর্ষে জাতির দায়িত্ব তাঁর অবদানের যথার্থ মূল্যায়ণ করা, নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবন সাধনার এবং শিক্ষা ভাবনার কথাকে পৌছে দেওয়া। সমসময়ে আমাদের সকলের শ্রদ্ধা নিবেদিত হোক তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি।